অভিবাসী শ্রমিক: পররাষ্ট্রের লোভ আর নিজ রাষ্ট্রের দায়

ফিরোজ আহমেদ

সম্প্রতি মানবপাচার ও সাগরে ভাসমান শ্রমিকদের ভয়ংকর অবস্থার খবর প্রকাশিত হওয়ায় তা নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। মুনাফার উন্মাদনা, বিনিয়োগের নিরাপত্তা এবং দারিদ্র -বেকারত্বের অনিশ্চয়তা মিলে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় শ্রমিক অভিবাসন, মানবপাচার এবং আধুনিক দাসশ্রম বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে কার্যকর রয়েছে। এর শেকড় অনেক গভীরে, এবং এর ঐতিহাসিক ধারাবহিকতা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে এরই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

অভিবাসী শ্রমিক সভ্যতার এক আশ্চর্য জ্বালানি! কিন্তু দেশান্তরী 'বেআইনী' শ্রমিকরা তাদের মাঝেও বিশেষভাবে অনন্য। এদের তুমি সবচে কম পয়সায় খাটাতে পারবে, এদের জীবন-নিরাপত্তা-জীবিকার আইনী নিশ্চয়তা থাকবে সবচে কম। এবং শেষত, কারণে কিংবা অকারণে যে কোন বদনাম এদের গায়ে সেঁটে দিয়ে যে কোন মূহুর্তে পালে পালে আটকে রাখতে পারবে বন্দীশিবিরে কিংবা কারাগারে। খেদিয়ে দিতে পারবে দেশ থেকে। শূন্যস্থান দখল করতে যারা ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে সাগরে, তাদের জন্যও বিরাট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আগেকার লোকদের পরিণতি, দেশান্তরী বুঝে নেবে- কারণে শুধু নয়, অকারণেও সে বিপন্ন হতে পারে। পলাতক মানুষের জীবনটাকেই মেনে নিতে শিখবে তারা।

এতকিছু করেও ঝামেলা সর্বদা এড়ানো যায় না। বৈধ কিংবা অবৈধ অভিবাসীদের মানবেতর জীবন, অমর্যাদা আর অনিশ্চয়তার সংবাদ টাকাওয়ালা দেশগুলোর জন্য প্রায়ই বিড়ম্বনা ডেকে আনে। বিড়ম্বনা বনাম মুনাফাকে দাড়িপাল্লায় মাপলে কোনটার ওজন বেশি হবে, সেটা সবাই-ই খুব ভাল করে জানে। ফলে মুনাফা কামাতে যদি বিড়ম্বনা এড়াবার উপায় আদৌ না থাকে, বিড়ম্বনা-ব্যবস্থাপনার অজস্র পদ্ধতি তো আছেই। অভিবাসী-শ্রমিক বিষয়টা নিয়ে এইভাবেই চলছে বহু শতাব্দী জুড়ে। আমরা সাধারণত শুধু দেখি ধনী দেশে যাওয়ার জন্য গরিব দেশের মানুষের বেপরোয়া আকুতি, বান কি মুন নামের ভদ্রলোকটি সেটাকেই গালভরা বাক্যে প্রকাশ করেছেন:

"অভিবাসন হলো মর্যাদা, নিরাপত্তা আর সুন্দরতর ভবিষ্যতের জন্য মানব আকাঙ্খার একটা প্রকাশ। এটা সামাজিক বুননের একটা অংশ, অংশ একটা মানব পরিবার হিসেবে আমাদের গঠনেরও।"

১. কিন্তু শত শত বছর ধরে! হুম, অন্তত শিল্প বিপ্লবের শুরুর অব্যবহিত পর থেকেই এটা প্রধান প্রবণতা হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন ঘটেছে এমন স্থানগুলোতেও কৃষি-শ্রমিকের চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে স্থানীয় বা অস্থানীয় মজুরে চাহিদা পূরণ না হলে আধুনিক দাসশ্রমেরও প্রয়োজন পড়ে। যেমন শিল্প বিপ্লবের পর চিনির চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ধরে এনে ক্যারিবীয় অঞ্চলে আখ ও তামাক চাষে দাস হিসেব নিয়োগের রমরমা বাণিজ্যের প্রচলন ও প্রসার ঘটে ১৬ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত। তবে অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে এর সম্পর্কটি এত ঘনিষ্ঠ যে, ১৮২০ এর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দাস ব্যবস্থা নতুন করে শক্তিশালী হতে থাকে। মার্কিন সংবিধানের খসড়া রচিত হয় ১৭৮৭ সালে, সেখানে ১৮০৮ সালের আগে দাস আমদানি অবৈধ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই বিশ বছরের নিষেধাজ্ঞার সুযোগে আরও আড়াই লক্ষ মানুষকে আফ্রিকা থেকে দাস হিসেবে ধরে নিয়ে আসা হয়, যা এর আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। ১৮০৮ সালে আটলান্টিকে দাস পরিবহন নিষিদ্ধ হবার পর বৃদ্ধি পায় মার্কিন মুল্লুকের অভ্যন্তরীন দাস বাণিজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বাকি অঞ্চল থেকে দাসদের কিনে নিয়ে আসা হয় দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোর লাভজনক তুলা শিল্পে। দাসযুগের অবসান ঘটেছে, অন্তত প্রকাশ্যে। দুনিয়া জুড়ে দাসশ্রম আজ বেআইনী। সেজন্য রক্তপাত কম হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) হয়েছে, হাইতির মত ক্ষুদে দ্বীপদেশ ফরাসি বিপ্লবের আহবানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৮০৪) করে মুক্তি অর্জন করেছে। কোন রাষ্ট্রই আজ স্বীকার করবে না দাসব্যবস্থার অস্তিত্ব। কিন্তু সস্তাশ্রম যে লাগবেই! ফলে অপ্রকাশ্যে বহু শিল্পে দাসেরা আজও যেমন আছে, প্রকাশ্যেই আছে অভিবাসী শ্রমিকরা। দাসদের মত এদের জীবন ও সম্মান মালিকের মর্জির ওপর নির্ভরশীল না হলেও নাগরিকের, শ্রমিকের কিংবা মানুষের পূর্ণ মর্যাদা তাদের জন্য স্বীকৃত না। শুরুতেই অভিবাসী শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তাটা পরিস্কার করা যাক। আজ থেকে একশ দশ বছর আগে, ১৯০৬ সালে মার্কিন এক ধনকুবেরের সাথে কাল্পনিক একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে ম্যাকসিম গোর্কি লিখছেন-

কোনো রাষ্ট্রই আজ স্বীকার করবে না দাসব্যবস্থার অস্তিত্ব। কিন্তু সস্তা শ্রম যে লাগবেই! ফলে অপ্রকাশ্যে বহু শিল্পে দাসেরা আজও যেমন আছে, প্রকাশ্যেই আছে অভিবাসী শ্রমিকরা। দাসদের মতো এদের জীবন ও সম্মান মালিকের মর্জির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হলেও নাগরিকের, শ্রমিকের কিংবা মানুষের পূর্ণ মর্যাদা তাদের জন্য স্বীকৃত না।

"সর্বনাশ? চোখদুটো বিস্ফোরিত করে সে আওড়াল। 'সর্বনাশ তখনই যখনশ্রমের দাম বেশি। যখন ধর্মঘট হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আছে অন্য দেশ থেকে এখানে যারা বসবাসের জন্য আসছে, সেই দেশান্তরীর দল। তাদের কল্যাণে শ্রমিকদের মজুরি সব সময় নিচের দিকে থাকে, ধর্মঘটীদের জায়গায় কাজ করার

জন্য তারা মুখিয়ে আছে। দেশে যখন এই রকম লোক যথেষ্ট পরিমানে এসে জুটবে, যারা শস্তায় কাজ করবে এবং কিনবে অনেক, তখন সব ভালো চলবে।"

গোর্কির দেখা মার্কিন মুল্লুকের এই চিত্রটির অনুসঙ্গগুলোর এদিক সেদিক হয়েছে, কিন্তু দেশান্তরী-শ্রমিকের ভূমিকার কোন রদবদল নেই। মার্কিন শিল্পখাত গড়ে ওঠার জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে ল্যাতিনো, মেক্সিকান, কৃষ্ণাঙ্গ আর চিনাশ্রমিকদের দেহ। বিশেষ করে দাসব্যবস্থা উঠে যাবার পরের সময়েও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা বিশেষ নিপীড়ন ও অধিকারহীনতার শিকার হয়েছেন। বিনিময়ে কিছু চাইতে গেলে জুটতো গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচার, পুলিশি দমন, জেল, গুপ্তহত্যা, এমনকি সেনাবাহিনীর গোলাও। স্বদেশী নাগরিকদের প্রতিও এমন ব্যবহারের কমতি নেই ইতিহাসে, কিন্তু নাগরিক অধিকারই নেই এমন মানুষদের ওপর শক্তি প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক। সস্তা শ্রমিক বিদেশ থেকে আমদানির সুবিধার একটা দিক যেমন প্রায় দাসশ্রমে কাজ চালানো যায়, তেমনি দেশীয় শ্রমিকদেরও মজুরির লাগাম টেনে রাখা যায়। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের বিকাশের আগের পর্বে দেশজ শ্রমিকদের সাথে বহিরাগত শ্রমিকদের রেষারেষি ছিল নিত্যকার ঘটনা, প্রায়ই তা দাঙ্গার পর্যায়েও পৌঁছাতো। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের উন্নতির একটা পর্যায়ে ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষাটা হলো এই যে, প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার স্বীকার করে নিলেই বরং মালিক পক্ষের এই ফাঁদটা থেকে কার্যকরভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। না হলে বহিরাগত শ্রমিকদের ব্যবহার করে মালিক শ্রমের মূল্য কমিয়ে ফেলে, কাজের পরিবেশের নিরাপত্তা নিয়েও গাফিলতির সুযোগ পায়। চরম প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারগুলোতে এই রেষারেষিটা কমবেশি এখনও বজায় আছে, আর তা জন্ম দেয় নানান রকম রাজনৈতিক টানাপোড়েন আর হিসাব নিকাশের। আজও দেখা যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের শ্রমকে পানির দরে শোষণের বন্দোবস্ত যেমন আছে, অন্যদিকে অভিবাসীদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিদ্বেষকে পুঁজি করে নানান রকম ডানপন্থী বর্ণবাদী ও জাতিবিদ্বেষী রাজনীতির বিকাশও ঘটছে। অভিবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালয়েশীয় নাগরিকদের বর্ণবাদী অনুভূতির ভয়াবহ রকম সব প্রকাশ সাম্প্রতিক অভিবাসী সঙ্কটের সময়েও দেখা গেছে অনলাইনে। পত্রিকা ঘাটলে মালদ্বীপ, মধ্যপ্রাচ্যে এমন অজস্র ঘটনা পাওয়া যাবে।

২. কিন্তু কারা অভিবাসী হয়? দেশত্যাগ কেন করে মানুষ? দেশত্যাগের একটা আদিম কারণ খাদ্যের অভাব। উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে আর ভরন-পোষণ করতে পারে না এমন সব জাতিতেই বাধ্যতামূলক দেশত্যাগের বন্দোবস্ত থাকতো। প্রাচীন আর্য, সেমেটিক, গ্রিক, রোমান, জার্মান জাতিগুলোতে দেখা যাবে বসতিস্থাপনকারীদের নেতৃত্বে নতুন নতুন জনপদের প্রতিষ্ঠা। এই নতুন জনপদের প্রতিষ্ঠা ঘটতো প্রায়শই পুরনো বাসিন্দাদের পরাজিত ও ধ্বংস কিংবা বিতাড়িত করে। কখনো তা ঘটতো তাদেরকে অধীনস্ত বানিয়ে।

প্রাচীন ইতিহাসে আরেকটা অভিবাসন হতো দাসদের। প্রথমদিকে যুদ্ধে পরাজিত জাতিগুলো দাসে পরিনত হতো, পরে দাসের চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধি পেলে দাসের প্রয়োজনেই নিত্যনতুন অভিযানের আয়োজন করা হয়। মেসোপটেমিয়, মিশরীয়, রোমান, গ্রিক সভ্যতায় স্রেফ দাসের সন্ধানে অজস্র যুদ্ধের ইতিহাস আছে। দাসব্যবস্থাই অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার ছিল বলে এই যুগকে ইতিহাসে দাসযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের আগে আফ্রিকা জুড়ে দাস ব্যবসার জন্য পরিচিত ছিল আরব সওদাগররা। সৌদি আরব আর ইয়েমেনে মাত্র গত শতকের মধ্যভাগে ১৯৬২ সালে দাস ব্যবসা আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আধুনিক কালের সূচনা লগ্নে ইউরোপের নগরায়নের চাহিদা মেটাতে আফ্রিকা থেকে বিপুল দাস আনা শুরু হয় ষোল শতকের শুরুতে, অগ্রবর্তী ছিল পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ব্যবসায়ীরা। অচিরেই ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের আখের খামারগুলো 'শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়ে' ভরে উঠতে থাকে। চিনি ছিল শিল্পবিপ্লবের শুরুর দিকে পৃথিবীর সবচে লাভজনক উৎপাদনগুলোর একটি, আর তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের অমানবিকতম দাসব্যবস্থা। আধুনিক কালে খাদ্য বা কর্মসংস্থানের অভাবে দেশের বাইরে কাজ খুঁজতে বাধ্য হবার সবচে বড় উদাহরণ আইরিশ জাতি। দখলদার বৃটিশদের অত্যাচারে প্রতিবেশী আইরিশরা উনিশ শতকে ভয়াবহ সব দুর্ভিক্ষের শিকার হন। এই মানুষগুলোকে লাখে লাখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে উৎসাহও দেয়া হয়, লক্ষ ছিল আইরিশ জাতিগত প্রতিরোধ দুর্বল করা। বৃটিশ জমিদারদের মালিকানা লাভের পর কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বিপুল সংখ্যক আইরিশকে উদ্বৃত্ত মানুষে পরিণত করে ফেলে নিজের ভূমিতে। এই বাড়তি মানুষদের প্রধান গন্তব্যস্থল হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আধুনিককালের সূচনালগ্নে ইউরোপের নগরায়ণের চাহিদা মেটাতে আফ্রিকা থেকে বিপুল দাস আনা শুরু হয় ষোলো শতকের শুরুতে, অগ্রবর্তী ছিল পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ব্যবসায়ীরা। অচিরেই ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের আখের খামারগুলো 'শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়ে' ভরে উঠতে থাকে।

আইরিশ মজুরেরা ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলেও সস্তায় দেশান্তরী মজুর হিসেবে কাজ করতেন। জমিদার বা বড় কৃষকরা স্থানীয় কৃষকদের নিয়োগ না দিয়ে আইরিশ মজুরদের ব্যবহার করতো। আইরিশদের শারিরীক গঠন বৃটিশদের তুলনায় দুর্বলতর হলেও মজুরি তারা এত কম নিতো যে সদ্য উদ্ভাবিত বাষ্পচালিত নৌযানে যাতায়াতের খরচার পরও নিয়োগকর্তার তাতে লাভ বেশি হত। রেলগাড়ি আসার পর এই আইরিশ কৃষকদের আগমনের হার আরও দ্রুত বাড়তে থাকলো। কাজ বঞ্চিত বৃটিশ কৃষিশ্রমিকরাও দলবেধে হামলা চালাতো আইরিশদের ওপর, দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনোখুনি প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিনত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনী কর্তারা দাঙ্গার মূহুর্তগুলোতে আইরিশদের রক্ষায় সামান্য ব্যবস্থাই নিতো, কেননা এতে দাঁড়াতে হতো স্বদেশী ভোটারদের বিরুদ্ধে। ওদিকে বৃটিশ চাকরিদাতারা স্বদেশী-শ্রমিকদের চাইতে আইরিশ চাষীদের নিয়োগ করতে পারলেই বেশি খুশি হতো। ফসল কাটার সময়ে আইরিশ মজুর বহন করতে একদিকে রেলগাড়িতে বাড়তি খোলা কামরা জুড়ে দেয়া হতো, অন্যদিকে ক্ষুদ্ধ বৃটিশদের তাদের ওপর পাথড় ছুড়ে মারাটাও ছিল নৈমত্তিক ঘটনা। ১৮৫০ এর আশেপাশের সনগুলোতে কাজের

সন্ধানে বছরপ্রতি দুই তিন লাখ করে আইরিশভাষীর ইংল্যান্ডে যাবার ইতিহাস আছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগেই লিভারপুলের মত বড় বড় নগরেও বিশাল সব আইরিশ বসতি গড়ে ওঠে, জাহাজ নির্মাণের মত শিল্পে তারা ইংরেজ-শ্রমিকদের হটিয়ে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে তাদের মারামারি-দাঙ্গা-রেশারেশি ইতিহাসবিশ্রুত। মালিকরাও এই বিভাজনে উৎসাহ দিতেন। ইংরেজ শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙাতে আইরিশ মজুরদের ব্যবহার ঘটেছে, মজুরি কমিয়ে রাখার জন্য তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্থানে আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের বোধ জন্ম নেয়ার প্রক্রিয়ায় এই দাঙ্গা-রেশারেশির অনেকটাই অবসান ঘটলেও তা পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। অভিবাসী-শ্রমিকরা ইংল্যান্ডের ইংলিশ চরিত্র বা স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে বলে যারা মনস্তাপে ভোগেন, তারা কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারেন এই ভেবে যে, চিরস্থায়ী বলে কিছু আসলে নেই। ইংল্যান্ডের শিল্পায়ন ও নগরায়নের ইতিহাস এই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংঘাতেরই বিকাশ। যে প্রক্রিয়া সস্তাশ্রমের লোভে একদিকে এই সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের প্রলুব্ধ করেছে, অন্যদিকে স্বদেশে তাদের থাকাটাকেই অসম্ভব করে দিয়েছে, সকল কৃতিত্ব সেই পুঁজিবাদী শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটিরই।

৩. কিন্তু অন্য একটি দিকেও মনোযোগ দেয়া দরকার, প্রাচীন পৃথিবীর দেশান্তর ঘটতো প্রধানত চাষযোগ্য জমির অভাবে। উনিশ শতকেই প্রথমবারের মত দেশান্তরী হবার নতুন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কারণও পাওয়া গেলো: অতিউৎপাদন। পরাধীন, দুর্ভিক্ষপীড়িত, দুঃশাসনের শিকার আইরিশদের মত না হলেও দৃষ্টিগ্রাহ্যহারে দেশত্যাগে বাধ্য হতো স্বয়ং বৃটিশরাও! আধুনিক অভিবাসনের নতুন প্রবণতাটি হলো যুদ্ধ-অনাহার-বাড়তি জনসংখ্যাসহ আগের কারণগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রতিযোগিতা, অতিউৎপাদনের নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়া। শিল্পায়নের কোন কোন ধরনে মানুষ তার নিজের ভূমিতেই উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে, সেটা শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই ঘটে চলেছে।

১৮৪৭-১৮৫২ সালের মাঝে প্রায় ১২ লাখ আইরিশ যুক্তরাজ্য ত্যাগ করে। ওই পাঁচ বছরেই প্রায় সাড়ে ৩ লাখ বৃটিশও অভিবাসী হয়ে যুক্তরাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ঋণগ্রস্ত, ভবিষ্যত বিষয়ে নৈরাশ্যগ্রস্ত ছোট কৃষকরাই বিশেষ করে এই দেশত্যাগীদের দলে ভীড় জমায়। তারা যায় মার্কিন মুল্লুকে, তখনো অনাবাদী বিশাল দেশটায় নতুন নতুন আবাদ গড়ে তুলতে। 'অনাবাদী' শব্দটার নির্বাচনে একটাই জটিলতা, এই ইউরোপীয় অভিবাসীরা আসলে দখল করে 'রেড ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত মার্কিন মুল্লুকের আদি বাসিন্দাদের কৃষি ও শিকার-ভূমি, তাদেরকে দলে দলে গণহত্যার শিকার করা হয়, কিংবা এক একটা অসম যুদ্ধের পর ঠেলে দেয়া হয় পানিহীন অনুর্বর মরু অঞ্চলের সংরক্ষণাগারগুলোর বন্দি জীবনে।

ইংল্যান্ড থেকে অজস্র হারে বিদেশে অভিবাসনের এই সময়টাই বৃটিশ উৎপাদকদেরও শনৈ শনৈ বিকাশের যুগ। এই সময়েই জার্মানিতেও শিল্পায়ন ও কৃষিতে আধুনিকায়ন শুরু হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আর দুর্ভিক্ষাক্রান্ত আয়ারল্যান্ডকে বাদ দিলে জার্মানিই হয়ে দাঁড়ায় সবচে বড় অভিবাসী মানুষের দেশ, গন্তব্য ওই মার্কিন মুল্লুক। হবসবমের হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রতি ছয়জনে একজন শ্রমিক ছিলেন উদ্বৃত্ত, মানে স্বদেশে তার পক্ষে কাজ যোগাড় করাটা ছিল অসম্ভব। এভাবে জার্মানিতে প্রতি বিশ জনে একজন, ফ্রান্সে ২৫ জনে একজন উদ্বৃত্ত মজুরে পরিণত হয়। এরা ছিলেন কৃষিতে আধুনিকায়ন ও ব্যক্তিমালিকানার বিকাশের ফলে সদ্য কৃষি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং একইসাথে শিল্পে যন্ত্রকৌশল ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুবাদে উদ্বৃত্ত শ্রমিকে পরিণত হওয়া জনগোষ্ঠী। অচিরেই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এই দৌড়ে যুক্ত হয় ইতালি, তারাই যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের অভাব পূরন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস প্রথম থেকেই যথেষ্ট জাতিবিদ্বেষী। জার্মান, ইংরেজ ও আইরিশরা সেখানে ভাগ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেলেও উনিশ শতকে অন্যান্য অ-ইউরোপীয় জাতিভুক্তদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো, বলা উচিত যে অন্য জাতিভুক্ত মানুষের কোন ন্যূনতম আইনগত অধিকার ছিল না। বৃটিশ জাহাজের বয়লার রুমের অত্যাচার সহ্য করতে না পারা বাঙালি নাবিকরা সেখানে কি রকম প্রতিকূলতা আর নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন, তার বিবরণ সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'বেঙ্গলি হার্লেম অ্যান্ড দা লস্ট হিস্টরিজ অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকা'নামে। দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া মার্কিন কিংবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠিতে বিয়েশাদী করে এই বাঙালি অভিবাসী জনগোষ্ঠী মার্কিন স্রোতের মূলধারা থেকে নিজেদের প্রায় অদৃশ্য করে অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। মাতৃভূমির সাথে উত্তরসূরিদের যোগাযোগ না থাকলেও তাদের স্বতন্ত্র একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী পাঞ্জাবি জনগোষ্ঠীর সদস্যদের 'লিঞ্চ' বা 'ঝুলিয়ে দেওয়া' হরদম ঘটতো। রেললাইন নির্মাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার করা হয়েছে বিপুল চীনদেশি শ্রমিককে। খুব সস্তায় এদের পাওয়া যেত। এরা প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের পরবর্তী বিপর্যস্ত সময়ে চীন ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, প্রধানত তারা ছিলেন খুদে কৃষক ও কারিগর শ্রেণির মানুষ। কৃষ্ণাঙ্গদের পর এরাই সবচে বেশি বর্ণবাদী আইন ও সামাজিক বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

আড়কাঠি শব্দটা একদা বাংলা সন্নিহিত অঞ্চলে ও সাহিত্যে খুব পরিচিত ছিল, এই আড়কাঠিদের পেশা ছিল ভাগ্যপীড়িত ব্যক্তি কিংবা কখনো কখনো আস্ত গোষ্ঠিকে ফুসলিয়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে যেতে রাজি করানো। বিনিময়ে দালালি বাবদ মালিকদের কাছ থেকে জুটতো ভাল অঙ্কের টাকা।

বাঙালিদের বাইরে অভিবাসন এবং বাঙলায় বিদেশীদের অভিবাসনের পরিমান তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হলেও এর ব্যাপকতা কিন্তু খুব কম না। অস্ট্রেলিয়ায় মরুভূমিতে পরিবহনের জন্য একদা রাজস্থান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল উট, আর আফগানিস্তান থেকে উটচালক। হালে জানা যাচ্ছে 'আফগান' নামে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীতে বাঙালিরাও ছিলেন। বাঙালি বংশোদ্ভুত একজন অস্ট্রেলিয় গবেষক উনিশ শতকে নির্মিত অস্ট্রেলিয়ার আদিতম মসজিদ থেকে আবিষ্কার করেছেন কোলকাতা থেকে প্রকাশিত একটা বাংলাপুস্তক, যা সেখানে উপাসনাগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত কিংবা জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে মরিসাসে, মাদাগাস্কারে, আফ্রিকার আরও নানান স্থানে। এমনকি মালয়েশিয়াতেও বেশ বড়সড়

একটা জনগোষ্ঠীর পূর্বসূরী বাঙালি ও অন্যান্য ভারতীয় মানুষজন। মালয়েশিয়ার অঞ্চলগুলোতে প্রাধান্য বিস্তারের পর বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে আঠারো আর উনিশ শতকে বৃটিশরা তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল নানান দাপ্তরিক কাজকর্ম, কুলি, ব্যবসায়ি, পুলিশ আর সৈনিকের কাজ করার জন্য।

আড়কাঠি শব্দটা একদা বাংলা সন্নিহিত অঞ্চলে ও সাহিত্যে খুব পরিচিত ছিল, এই আড়কাঠিদের পেশা ছিল ভাগ্যপীড়িত ব্যক্তি কিংবা কখনো কখনো আস্ত গোষ্ঠিকে ফুসলিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে যেতে রাজি করানো। বিনিময়ে দালালি বাবদ মালিকদের কাছ থেকে জুটতো ভাল অঙ্কের টাকা। বাংলায় শেষ বড় অভিবাসনগুলো হয়েছে সস্তাশ্রম ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য পেশাগুলোর চাহিদা মেটাবার জন্য। অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে, তারপর তাদের বারংবার উচ্ছেদ করে নতুন কোথাও বসানো হয়েছে। চা বাগান আর পরিচ্ছন্নতা কর্মি হিসেবেও বেশ কিছু জনগোষ্ঠীর মানুষকে বাংলা ও আসামে নিয়ে আসা হয়েছে। '*চল মিনি আসাম যাবো, দেশে বড় দুঃখ রে...*' গানটি আড়কাঠির পাল্লায় পড়া এক অভিবাসীরই চিরকালের দুঃখের প্রতিচ্ছবি। '*সর্দার বলে কাম কাম, বাবু বলে ধইরে আন, সাহেব বলে লিবো পিঠের চাম, হায় যদুরাম, ফঁকি দিয়া পঠইলি আসাম*' এই বাক্যগুলো আজও মালয়েশিয়া কি থাইল্যান্ডে দাসশ্রমে বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর জন্য কতটুকু অসত্য?

৪. থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়ার উপকূলে ভাসমান মানুষগুলো নিয়ে পত্রপত্রিকায় কম কথা হলো না। সমুদ্রে ভাসমান মানুষগুলো অবৈধ, স্রেফ এই সুবিধাটুকু নিয়ে থাইল্যান্ড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সত্যটিকে বিশ্ববাসীর সামনে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করলো, সেটি হলো এই অভিবাসীদের সে নিজেই প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসে দেশটির মৎস্যশিল্পের মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য। প্রায় দাসশ্রমের পরিস্থিতিতে কাজ করা এই মানুষগুলোর বর্ণনা আর নতুন করে না দেই, কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার এটা থাই রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাতেই চলেছে। সমুদ্রে ভাসমান অভিবাসীদের নিয়ে তোলপাড় হবার অন্তত এক বছর আগেই যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK (১০জুন,২০১৪) শীর্ষক সংবাদটিতে উল্লেখ করা হয়েছে এই দাসশ্রমের কথা। এই প্রতিবেদনে প্রায় তিন লাখ দাসশ্রমের যুক্ত থাকার কথা বলা আছে, যাদেরকে বিশ ঘন্টা দৈনিক কাজ করানো হয়, প্রতিবাদ করলে বেধড়ক পিটুনি শুধু নয়, হত্যাও করা হয়। অনেকেই ডাঙায় ওঠার সুযোগই পায় না বছরের পর বছর, একটানা কাজ করাবার জন্য তাদেরকে মাদক সেবনও করানো হয়। কিন্তু ওই প্রতিবেদনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় কোন ভূমিকা নিতে থাই সরকারের পরিস্কার অনিচ্ছার বিষয়টি। মুখে তারা দাসশ্রম নিরোধকে অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করলেও এটা বন্ধ করার কোন আইনগত কিংবা কাঠামোগত পদক্ষেপ কখনো নেয়া হয়নি। নিয়োগদান প্রক্রিয়াকে আইনসঙ্গত করা হলেই পরিস্থিতির বদল হতো, কিন্তু তাতে নিয়োগকৃত শ্রমিককে একটানা কাজ আর করানো যেতো না। দিতে হতো কিছুটা বাড়তি মজুরি, পরিবারের সাথে যোগাযোগের সুযোগ এবং নিরাপত্তা। যতদিন সম্ভব, এই বর্বর পরিস্থিতি যে থাই সরকার বহাল রাখবে, তাতে আর সন্দেহ কি! মৎস্য রফতানি থাইল্যান্ডের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার খাত যে! ফলে আজকে আন্তর্জাতিক হৈচৈ এর মাঝে তারা নানান উচ্চমহলের যে সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাচ্ছে, অমুক জেনারেল তমুক গর্ভনরকে গ্রেফতার করছে, জরিমানা করছে, তার বড় অংশই লোক দেখানো। কারণ পরিস্থিতি যে এতটা ভয়ঙ্কর, তার সংবাদ আগে থেকেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসেছে। ফলে বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল বহু আগেই থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোরশ্রমনীতি নিয়ে প্রশ্ন করা, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে বিষয়টা তোলা। যে পরিমানশ্রমিক তাদের লাগবে মোটামুটি সেই পরিমানশ্রমিক যেন তারা বৈধপথেই, সম্ভব হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নিয়োজিত করার বন্দোবস্ত করে, সেই বিষয়টি আলোচনায় রাখা। সেটা বাংলাদেশ কখনো করেনি, বরং এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটতে দিয়েছে, এবং বলা যায় এখনো এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্য বাংলাদেশের শাসকদের চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণও। ফিলিপাইন,শ্রীলঙ্কাসহ বহু দেশ যখন মধ্যপ্রাচ্যে নারীশ্রমিকদের ওপর নীপিড়নের প্রতিবাদে সেখানে গৃহপরিচারিকা পাঠানো বন্ধ করেছে, বাংলাদেশ তখন সোৎসাহে মাত্র পনেরো হাজার মাসকাবারি চুক্তিতে কোন আইনী প্রতিরক্ষা ছাড়াই তাদের পাঠাবার চুক্তি করে উল্লাস প্রকাশ করছে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে খারাপ শ্রমপরিবেশের দেশগুলোর একটি মালয়েশিয়া। এই তালিকাতে এর চেয়ে নিকৃষ্টতর স্থান পেয়েছে কেবলমাত্র সামরিক শাসন বা যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যে থাকা দেশগুলো।

দ্বিতীয়ত, এই দাসবাজারে মানুষকে ফুসলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে যে মানব পাচার জালের জন্ম হয়, তারই অনুসঙ্গ বন্দীশিবির, মুক্তিপন আদায়। এই বিষয়টাও বাংলাদেশ সরকারের অজানা থাকার কোন কারণ নেই। মালয়েশিয়া যাবার কথা বলে মানুষজনকে থাইল্যান্ডে নিয়ে মুক্তিপন আদায়, মুক্তিপন না দিতে পারলে অন্তত চার বছর দাসশ্রম দিতে বাধ্য করার গা শিউরানো সংবাদ আজ থেকে তিন বছর আগে ৭ ডিসেম্বর ২০১২ তে প্রথম আলোর '*থাইল্যান্ড সীমান্তে পৌঁছেই লাখ টাকার মুক্তিপণ*' নামের সংবাদে পাওয়া যাবে। যারা ওই মুক্তিপনের টাকা দিতে পারেন, তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হতো মালয়েশিয়ায়। অপরাগতায় থাই মাছধরা নৌকোতে কয়েক বছরের দাসশ্রম। কদিন আগে 'আদমপাচারের চেষ্টার সময়ে' ক্রসফায়ারে নিহত জাফর মাঝির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রথম আলো বলছে এক একটা দফার সফল মানব-পাচারের পরে তিনি কয়েক লাখ টাকা পেতেন। বোঝাই যায় সামান্য মাঝি কয়েক লাখ টাকা পেলে যাদের ছত্রছায়ায় এসব চলে তারা কত আয় করেন। বছরে লাখ খানেক মানুষ যদি টেকনাফ-কক্সবাজার উপকূল দিয়ে পাচার হয়, তাহলে এই অর্থনীতির আকৃতি দাঁড়াবে অবিশ্বাস্য বিশাল। কিভাবে সম্ভব বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই পাচার পুলিশ, র‍্যাব, কোস্টগার্ড আর নৌবাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে চলা? দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জনপ্রতিনিধিদের বিনা অনুমতিতে এসব হতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। সেই কারণেই ক্রসফায়ারের নাটকও মঞ্চস্থ হচ্ছে। কিন্তু এই ভয়াবহ বিয়োগান্তক নাটকে আধুনিক দাসব্যবসার আধুনিক আড়কাঠির ভূমিকায় কারা

কারা অভিনয় করেছে, সেটা দেশবাসীর সামনে খানিকটা স্পষ্ট করে দিলো থাইল্যান্ডের গণকবরগুলো।

থাইল্যান্ডের মৎস্যশিল্পের তুলনায় পরিস্থিতি একটু ভাল হলেও মালয়েশিয়ারে অতীত ও বর্তমান কাজের পরিস্থিতিও খুব আকর্ষণীয় নয়। বর্তমান অভিবাসী শ্রমিক সঙ্কটটি যে শ্রম বাজারকে কেন্দ্র করে, সেই মালয়েশিয়ার শ্রমনীতিই আসলে বর্তমান সঙ্কটের অন্যতম উৎস। ইন্টারন্যাশলাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের ২০১৪ সালের প্রতিবেদনটি বলছে যে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর মাঝে সবচে খারাপ শ্রম পরিবেশের দেশগুলোর একটি মালয়েশিয়া। এই তালিকাতে এরচে নিকৃষ্টতর স্থান পেয়েছে কেবলমাত্র সামরিক শাসন বা যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যে থাকা দেশগুলো। মালয়েশিয়াসহ এই তালিকাভুক্ত দেশগুলোতে শ্রম পরিবেশের কোন নিশ্চয়তা নেই কিংবা নামমাত্র আইনগত কিছু প্রতিশ্রুতি থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের কোন ব্যবস্থা নেই। নব্য শিল্পায়িত এই দেশগুলোর মাঝে মালয়েশিয়াই সবচে বেশি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করছে। শুধু তাই নয়, নানান প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয় সরকার বৈধ শ্রমিকদের চেয়ে অবৈধ শ্রমিকদের নিয়োগে পরোক্ষ কিন্তু কার্যকর উৎসাহ প্রদান করছে। কৃষি শ্রমিকদের বড় অংশ, গৃহস্থালী শ্রমিকদের বিশাল অংশ এবং অন্যান্য শিল্পেও অবৈধ শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। মুখে আরেক কথা বললেও মালয়েশিয়া সরকারই এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। কেননা এর সুবিধা হলো এরা কোন আইনগত অধিকার পায় না, কম মজুরিতে এদের নিয়োগ করা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবৈধ শ্রমিকদের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে কম চাপে পরতে হয়। যে কোন সময়ে এদেরকে বহিস্কার ও শাস্তি দেয়া যায়, এদের ওপর আইনী নিপীড়ন চলে ব্যাপক। যে কোন বিপদের মূহুর্তে এদেরকে বেআইনী হিসেবে চিহ্নিত করে তার দায়দায়িত্বও অভিবাসীদের ওপরই চাপিয়ে দেয়া যায়। এতসব সুবিধার কারণেই নানান টালবাহানায় বৈধ পথে শ্রমিক আমদানি বন্ধ রেখে অবৈধ পথে তাদের আনার উৎসাহ দেয়া হয়।

এত ঝুঁকির পরও কিন্তু বৈধ কিংবা অবৈধ পথে মালয়েশিয়া যাবার জন্য মানুষের অভাব হবে না। কারণ দেশে অভাব। গ্রামাঞ্চলে যে বিপুল উদ্বৃত্ত তরুণ জনগোষ্ঠী মাসে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা আয় করতে পারেন, তার সামনে অজস্র উদাহরণ আছে মালয়েশিয়াতে কোনমতে একটা কাজ অবৈধভাবেও জুটিয়ে নিতে পারলে বিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা মাসে আয় করা যায়।

৫. কিন্তু মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডকে এত গোনাগুনতির কি আছে? কেন বাংলাদেশ সরকার সব কিছু জেনেও চুপ করে থাকে? তারা কি বাংলাদেশকে কোনভাবে বিপদে ফেলবে? বাংলাদেশের শ্রমিক ছাড়া মালয়েশিয়ার সব পণ্যের দাম বেড়ে যাবে, বহু খাত অচল হয়ে যাবে। থাইল্যান্ডের মাছ আন্তর্জাতিক বাজার হারাবে। বৈধ পথে শ্রমিক রপ্তানি শূন্যের কোঠায় চলে যাবার পরও সেখানে যে বিপুল পরিমান মানুষ যেতে পারছেন, সেটাই মালয়েশিয়ার গোপন চাহিদাকে তুলে ধরে। তাদের কাছ থেকে আমরা বহুগুন বেশি পণ্যও আমদানি করি। বাংলাদেশের চেয়ে বহু দরিদ্র দেশের মানুষও এত খারাপ শ্রমপরিবেশে কাজ করবে না। ওরকম কর্মপরিবেশে এসব ক্ষেত্রে কে কাকে সমঝে চলবে, তা নির্ভর করে শাসকদের সংস্কৃতি আর লোভের ওপরই। দাসশ্রম রফতানিতে যদি লুটেরার পকেট ভরতে পারে, সে দেশবাসীকে দাসশ্রমেই ঠেলে দেবে এবং দাসমালিকের প্রতিই নমো নমো করবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক দূতাবাসের কর্মীরা স্বদেশী বৈধ শ্রমিকদেরও সহায়তা করে না, বরং বিদেশী মালিকদেরই স্বার্থ রক্ষা করে এমন একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। পৃথিবীর মাঝে বাংলাদেশই অল্প ক'টি ব্যতিক্রমের একটি যেখানে প্রবাসী শ্রমিকদের সাথে দূতাবাসে কল্পনাতীত রকমের অপমানজনক ব্যবহার করা হয়। নগদ স্বার্থের বন্ধনই এই বাস্তবতার জন্ম দেয়। বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য এটা এমন একটা বাস্তবতা যেখানে তার শাসকরাই অপর পক্ষের হয়ে আড়কাঠির ভূমিকা নিয়েছে।

২০০৮ থেকে ২০১৩– এই ছয় বছরে ৫৬টি দেশ থেকে লাশ এসেছে ১৩ হাজার ৮৭২ জন প্রবাসীর। এর আগে ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এসেছে ছয় হাজার ১৭টি লাশ। আরো আগে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিন হাজার ৬১৩ জন প্রবাসী শ্রমিকের লাশ আসার তথ্য আছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে।

৬. এটাও ভাবা দরকার, কেন বিপুল সংখ্যক তরুণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছেন, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মালবাহী ট্রাকে কিংবা জাহাজের খোলে মৃত্যুবরণ করছেন, অজানা সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন। বিজন প্রান্তরে পরবর্তী ঘাঁটিতে পৌঁছাবার অপেক্ষায় বরফে জমে মরছেন। জাহাজডুবিতে ভূমধ্যসাগরের বহু অতল গহবর বাঙলাভাষীদের ডুবোকবরে পরিণত হয়েছে। বিমানের চাকা ধরে বিদেশে যাবার মরিয়া চেষ্টায় নিহত হতেও আমরা দেখেছি এক তরুণকে। একজন জৈষ্ঠ্য অভিবাসী বিশেষজ্ঞ দেখলাম লিখেছেন রোহিঙ্গা সমস্যা থেকে এর সূত্রপাত। এটা সম্ভবত সঠিক না। বাংলাদেশের সবচে বেশি অভিবাসী শ্রমিক আছে পাকিস্তানের করাচি নগরে, প্রধানত মৎস্যজীবী হিসেবেই। তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষাধিক এবং তাদের বড় অংশই আশি ও নব্বই এর দশকে পাকিস্তানে গিয়েছেন। ভারতের শ্রমবাজারে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী যুক্ত আছেন, এদের একটা বড় অংশ নারী। অন্তত এখন তো আমরা জানছি যে প্রায় ৪১টি জেলা থেকে থাইল্যান্ডে নিয়মিত মানুষ পাচার হয়।

মানব-পাচারের শিকারদের মাঝে মফস্বল আর গ্রামের মানুষদের আধিক্য একটা সহজ বিষয়ে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেটা হলো বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মানুষকে ধরে রাখার বিপুল অক্ষমতা। এবং এটা দেশে খাদ্যের ঘাটতির জন্যও নয়, আবার অন্য জাতির দখলদারিত্বের শিকার হবার জন্যও না। এই যে বলা হলো, বাংলাদেশ সরকার পরের স্বার্থের আড়কাঠির ভূমিকা পালন করে, এ বছরই তার একটা নমুনা দেখা যাবে ভারত থেকে চাল আমদানির বেলায়। দুনিয়া জুড়েই এবছর চালের উৎপাদনে রমরমা, অতিউৎপাদনের কারণে ফসলের দাম হুমকির মুখে। প্রতিবেশী সরকারগুলোও যখন এমন পরিস্থিতিতে কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় নানান রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার তখন রাতারাতি ভারতীয় চাল আমদানির বন্দোবস্ত করে দিলো শূন্য শুল্কে। নিন্দার মুখে সামান্য ১০ ভাগ কর বসানো হলো বটে, ততক্ষনে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। বাজার

ছেয়ে গেলো ভর্তুকি পাওয়া ভারতীয় সস্তা চালে। বাংলাদেশ সরকার যেন প্রতিনিধিত্ব করলেন ভারতীয় কৃষির স্বার্থের, নিজ দেশের কৃষকের ভাগ্যকে নির্লজ্জ বিসর্জনে। কৃষিক্ষেত্রে এই সব কারসাজির সাথে মানব-পাচার উৎসাহিত হবার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

ভারতীয় চাল এ বছরের বাড়তি উদাহরণ। কিন্তু প্রতি বছরই ধান ওঠার সময়ে সরকার কৃষকের শ্রমের দাম না ধরেই ধানের দাম নির্ধারণ করে, এবং তাও আবার কেনা হয় চাতাল মালিক আর দলীয় পাণ্ডাদের কাছ থেকে। এরই ফল গ্রামীণ জীবনে অস্থিরতা। গ্রামত্যাগে বাধ্য হওয়া নারীদের একটা বড় অংশ পোষাক শিল্পে সস্তা শ্রমিক হিসেবে কাজ নিতে বাধ্য হন। পুরুষদেরও একটা অংশ রিকশা চালানো, হকারিসহ নানান পেশায় যুক্ত হন। এভাবে নিজ দেশে অতি উৎপাদনের কালেও উদ্বৃত্তে পরিনত হওয়া মানুষের একটা অংশ অজানায় ঝাঁপ দেয়ার ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকেন। এদের কাহিনীই আমরা পড়ছি দৈনিকের পাতায় পাতায়, দেখছি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদে।

৭. বহু দরিদ্র অর্থনীতিতেই রূপান্তরের কালে একটা স্বল্প মেয়াদে অভিবাসী হবার তীব্র প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে এটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি আকারে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে স্বাধীনতার পর প্রতিটা বছরেই। প্রতি দশকে বাজেটের আকার বেড়েছে, প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, জিডিপি বেড়েছে। কিন্তু অভিবাসী হবার আকুলতা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতির মৌলিক গঠন কাঠামোরই একটা ভয়ঙ্কর সমস্যার দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয় দিচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে আজ স্বচ্ছল পরিবারগুলোর একটা বড় অংশ বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এর পাশাপাশি বহুগুন বেশি পরিবারে পাওয়া যাবে বিদেশে গিয়ে সর্বস্বান্ত হবার, জীবনের মূলবান সময়ের অপচয় শেষে ফেরত আসার ছাপা-না-হওয়া গল্প। পাওয়া যাবে নিখোঁজ হয়ে যাবার অজস্র কাহিনী। প্রতি দশকেই আরও খারাপ থেকে খারাপতরশ্রম পরিবেশেও কাজ করতে রাজি হওয়া মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরের একটি গবেষণায় দেখা যায়, সিঙ্গাপুরের মত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রেও বাংলাদেশী অভিবাসীশ্রমিকরা অধিকাংশ সময়ে বাসি খাবার পান। মালদ্বীপে নিয়মিত তাদের ওপর হামলা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ওপর নিপীড়ন তুলনা রহিত।

সম্প্রতি 'মানব পাচার, অভিবাসীশ্রমিক এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তা' শীর্ষক গণসংহতি আন্দোলনের মত বিনিময়ে পরিস্থিতির সারসংকলন করা হয়েছে এভাবে: বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার উৎস প্রবাসীশ্রমিকদের পাঠানো অর্থ। গত অর্থ বছরে এর পরিমান ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা। অন্যদিকে গত দশ বছরে দেশে এসেছে প্রায় বিশ হাজার প্রবাসী শ্রমিকের লাশ। এই লাশগুলোর দায় কেউ নেয়নি। এই মৃত্যুগুলোর একটা বড় অংশই অস্বাভাবিক। কর্মস্থলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে অসুস্থতা, বাসস্থান ও খাদ্য সঙ্কট, কর্মস্থলে শারিরীক নিপীড়ন, স্থানীয় বাসিন্দাদের হামলা, গ্রেফতারের আতঙ্ক, উদ্বেগ এই সব কিছুই এই মৃত্যুর সারিকে দীর্ঘতর করেছে। গোপনে পাচারের সময়ে কত অজস্র বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন মালবাহী ট্রাকে বা জাহাজের খোলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, জাহাজডুবিতে, সীমান্তরক্ষীর তাড়া খেয়ে, বরফে জমে তার ইয়াত্তা নেই। এই মৃত্যুর হার কত উদ্বেগজনক হারে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বোঝা যাবে একটি সরকারী তথ্য থেকেই। ২০০৮ থেকে ২০১৩- এই ছয় বছরে ৫৬টি দেশ থেকে লাশ এসেছে ১৩ হাজার ৮৭২ জন প্রবাসীর। এর আগে ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এসেছে ছয় হাজার ১৭টি লাশ। আরও আগে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিন হাজার ৬১৩ জন প্রবাসীশ্রমিকের লাশ আসার তথ্য আছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে।

বোঝাই যাচ্ছে, পরিস্থিতিটা কোন সাময়িক বিষয় না। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কোন নির্ভরশীলতার যায়গায় পৌঁছুতে পারেনি গত দশকগুলোতে, নাগরিকদের কর্মসংস্থান, বা উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ যেটুকু বিকশিত হয়েছে তা পরিস্থিতির তুলনায় এত সামান্য যে, হাঁস পেলে কি ছাগল চাষে সাফল্য পাওয়া গেলে আজও তা পত্রিকার শিরোনাম হয়। যে অজস্র মানুষ মুরগির খামার করে আটকা পড়েছেন, স্ট্রবেরি চাষ করতে গিয়ে মজুরি চেয়ে গুলি খেয়েছেন, তারা ঠাঁই পাচ্ছেন না পত্রিকার পাতায়। যে দুটি খাতে মুনাফার ভাগ জনগণের পকেটে গেলে জনগণেরে ক্রয়ক্ষমতা বাড়তো, দেশে শিল্পভিত্তি বিকশিত হতো, তার একটা পোষাক শিল্প, অন্যটি কৃষি। কৃষিতে কৃষকের মুনাফা কমিয়ে রাখা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে, যাতে সস্তায় পোষাকশ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে এই বিপুল উৎপাদনের কালেও কেন্দ্রাতিগ একটা বল অজস্র মানুষকে ছিটকে দিচ্ছে তার মাতৃভূমি থেকে।

ফলে অবৈধ অভিবাসনের আশু সমাধান একটাই, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাজার সন্ধান, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানবিক আইনী নিশ্চয়তাপূর্ণ বাজারে তাদের প্রেরণ। অন্যদিকে প্রয়োজন কৃষিপণ্যের মুনাফাটা যেন কৃষকের হাতে যায়, টাউট রাজনৈতিক পাণ্ডা আর চাতাল মালিকরা, সার-কীটনাশক আর বীজ ব্যবসায়ীরা যেন কৃষির সর পুরোটা খেয়ে না ফেলে। তাহলে অভিবাসনের চাহিদা যেমন কমবে, কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার কারণে দেশের মাঝে শিল্পোদ্যোগ আর কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে।

ফিরোজ আহমেদ: সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন। সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলন।

ইমেইল:subarnasava@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. [হোবসবম, ১৯৯৬] Hobsbawm, Eric (1996), The Age of Revolution (1789-1848), New York: Vintage Books.

২. গোর্কি, ম্যাক্সিম (১৯৮৭), *পীত দানবের পুরী*, মস্কোঃ রাদুগা প্রকাশন ।

৩. গার্ডিয়ান (২০১৪), "Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US" ১০ জুন, http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour

৪. প্রথম আলো (২০১২), "সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড সীমান্তে পৌঁছেই লাখ টাকার মুক্তিপণ", ৭ ডিসেম্বর, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-12-07/news/311273

৫. প্রথম আলো (২০১৫), "উখিয়ায়-'বন্দুকযুদ্ধে'-আরেক-মানব-পাচারকারী-নিহত", ১ মে, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/524701/

৬। International Trade Union Confederation, The World's Worst Countries for Workers